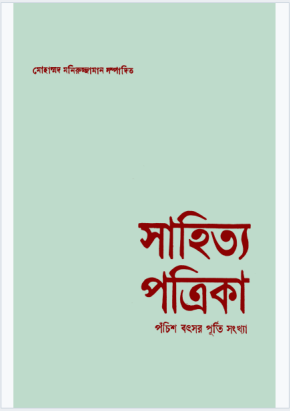


Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# মুক্তবুদ্ধি, বেগম রোকেয়া ও নারী-অধিকার

| | |
|---|---|
| Volume | 25 |
| Issue | 2 |
| Year | 1982 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | হাসনা বেগম |
| Published online | April 1, 1982 |
| DOI | 10.62328/sp.v25i2.6 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.6 |
| Pages | 114-120 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# মুক্তবুদ্ধি, বেগম রোকেয়া ও নারী-অধিকার

হাসনা বেগম

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর রোকেয়ার স্মৃতিতে সমগ্র বাংলার মুসলমান সমাজকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দেখে ১৯৩২ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছিলেন, ''ইহা শুধু যুগ-লক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ''।[১] তেমনি এই উক্তির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বর্তমানে তাঁকে সমাজ-সংস্কারক, নারী-শিক্ষা প্রচারক তথা বাংলাদেশের নবজাগরণেরই সূত্রপাতের অগ্রদূতী হিসেবে জাতীয় ভিত্তিতে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতে পারি।

সমাজ-সংস্কারক এবং সাহিত্যিক এই দ্বৈত ভূমিকায় বেগম রোকেয়ার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই হল তিনি বুদ্ধিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবেই তিনি যা গ্রহণীয় তা গ্রহণ করেছেন এবং যা বর্জনীয় তা বর্জন করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল মহান ব্যক্তিত্ব মানব জাতিকে যথার্থ অর্থে সভ্যতার আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের প্রতিজনকেই সমকালীন সামাজিক কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর তমসাচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। তাঁদের এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ যৎসামান্য হলেও তাঁদের সমাজ ও জাতিকে সভ্যতার পথে কিছুটা যে অগ্রসর করেছে তা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পথ চলতে গিয়ে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি এবং বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের—তাঁদের প্রত্যেকের জীবনী পাঠে আমরা এ তথ্য জানতে পারি। বেগম রোকেয়ার জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর জীবন সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ হয়েছে তার থেকে রোকেয়ার সংগ্রামী জীবনের যে ছবি আমরা পাই তা আমাদের যথার্থই বিস্মিত করে। সমাজ-সংস্কারক রোকেয়া তাঁর কার্যক্ষমতা ও তিতিক্ষা, আদর্শের মহত্ত্ব ও স্পষ্টতা, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা, সহনশীলতা ও দৃঢ়তা, এবং সর্বোপরি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছতা প্রভৃতির বিবেচনার দ্বারা পৃথিবীর প্রথম সারির সংস্কারকদের অন্যতম বলে গণ্য হবার যোগ্য কিনা সে মূল্যায়ন ভবিষ্যতই করবে। তবে বেগম রোকেয়ার জীবনী পাঠে এ-মত নিশ্চিতভাবেই প্রকাশ করা যায় যে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার সাথেই তিনি তাঁর অভীষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। একমাত্র সেই লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার পাবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কামনা তাঁর মনে যে বিন্দু মাত্রও স্থান পায়নি সে তথ্যটিও আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারি। রোকেয়ার সংগ্রামী জীবন স্মরণ করে আমরা যথার্থই বিস্মিত হই। আমরা বিস্মিত হই এই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোমল আর কঠিনের সংমিশ্রণ দেখে, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখে, আর সর্বোপরি তাঁর দৃঢ়তা ও সহনশীলতার পরিচয় পেয়ে। কিন্তু এই সকল গুণগুলোকেই আচ্ছন্ন করে দেয় সাহিত্য কর্মে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত তাঁর মুক্তবুদ্ধির হীরক-ঔজ্জ্বল্য। নারীমুক্তির সপক্ষে তাঁর নানাবিধ যুক্তির অবতারণাই তাঁর মুক্তবুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। এই সকল যুক্তির উপস্থাপনা করে তিনি নারী সমাজকে এবং সমগ্র বাঙালী সমাজকে বুদ্ধিমুক্তির অভিযানে যাত্রা

শুরু করার আহ্বান করেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথাই হল : বুদ্ধিকে মুক্ত করতে অক্ষম হলে সত্যিকারের মুক্তি আনয়ন একেবারেই অসম্ভব।

সমাজ-সংস্কারক রোকেয়ার পক্ষে স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা ছিল একেবারেই অসম্ভব। সমাজের অনুতে অনুতে যে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী একেবারে শিকড় গেঁথে বসেছিল তা উপড়ে ফেলে তাঁর যে আদর্শ সমাজ যার ধারণা হয়ত তাঁর *Sultana's Dream*[২] এবং 'পদ্মরাগ'[৩] এই দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, সেই সমাজকে বাস্তবায়িত করতে তিনি যে খুব সফল হননি তা বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা বিবেচনা করে আমরা নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি। তবে সকল প্রবল বাধা ও বিপত্তি, সোচ্চার প্রতিবাদ ও নিন্দা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দমন প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে বেগম রোকেয়া যে আমাদের বাঙালী সমাজকে অগ্রগতির দিকে অর্থাৎ সভ্যতার দিকে একটি গতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। রোকেয়ার মৃত্যুর আজ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরও সেই গতিশীলতা মাঝে মধ্যে স্তিমিত হয়ে পড়লেও এখনো একেবারে যে স্তব্ধ হয়ে পড়েনি তা আমরা তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে উপলব্ধি করছি। আমাদের এই বাঙালী জাতির অগ্রগতির পথে এক নতুন উদ্যম সৃষ্টির লক্ষ্যে বেগম রোকেয়ার সবল ও নিরঙ্কুশ প্রচেষ্টা তাঁকে এ জাতির সভ্যতার ইতিহাসে এক পথপ্রদর্শকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বেগম রোকেয়ার যে আদর্শ সমাজ সে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সর্বোচ্চ মূল্যে মূল্যবান হাতিয়ারই হল মানুষের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা ধীশক্তি। রোকেয়া তাঁর এই আদর্শ সমাজের রূপরেখা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আর আমরা তাই তাঁকে পাচ্ছি আরেকটি সত্তায় : সাহিত্যিক রোকেয়াকে। সমাজের সর্বস্তরে বিরাজমান এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট কুসংস্কার ও ধর্মের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারক হিসেবে রোকেয়ার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের পিছনে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মুক্তবুদ্ধির এবং এই মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারাই তিনি অবতারণা করেছেন নানা প্রকার প্রাসঙ্গিক যুক্তি ও তর্কের। স্বচ্ছ যুক্তির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করে তিনি তাঁর আদর্শকে যে জোরালো ভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে রোকেয়ার সমকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই শুধু বিস্মিত হয়নি, এখনো আজ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল গত হওয়ার পরও আমরা সেই বিদুষী মহিলার সাহিত্য পাঠ করে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারি না। স্বশিক্ষিত কিন্তু যথার্থ অর্থে সুশিক্ষিত এই মহিয়সী নারীর সাহিত্যেও—যেখানে বাস্তবরাজ্যকে কল্পনারাজ্যে পরিণত করার প্রবণতা এবং অভিপ্রায় সুস্পষ্ট, বক্তব্যের মধ্যে কোন প্রকার অযৌক্তিকতার স্থান নেই—শাণিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য জ্বল জ্বল করে আমাদের মনশ্চক্ষুকে যেন ধাঁধিয়ে দেয়, মুক্তবুদ্ধি আপন গরিমায় আপন সততার আলোতে মোহ আর অজ্ঞানতার তমসা কাটিয়ে তার চারপাশকে আলোকিত করে তোলে। রোকেয়ার সাহিত্য প্রচেষ্টা সুচিন্তিত, যুক্তিনিবদ্ধ এবং পরিমিতিবোধে সিক্ত—বুদ্ধি সেখানে রাজত্ব করে অর্থাৎ **Reason enthroned**। তাঁর সাহিত্যের কোথাও ক্রোধ, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক কিন্তু পরিচ্ছন্ন মন্তব্য—এ সবই তাঁর পরিমিতিবোধের এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। শাণিত মুক্ত তরবারির ন্যায় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর সপক্ষে সকল বিভ্রান্তিজনক ও হেত্বাভাসপূর্ণ যুক্তিকে খণ্ডন করে বাঙালী সমাজকে তিনি উন্নতির পথে তথা সভ্যতার পথে অগ্রসর হবার যৌক্তিকতা বোঝাবার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি যেখানে নিষ্প্রভ সেখানেই অন্যায় আর অবিচার, বুদ্ধি যেখানে ভুল পথে চালিত সেখানেই অসভ্যতা

আর বর্বরতা। আর বুদ্ধি যেখানে মুক্ত এবং শাণিত সেখানে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে—যে সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একই পথে সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে অগ্রসর হবে, জ্ঞানের আলো অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরীভূত করবে; সকলেই আপন আপন দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক আদর্শ সমাজ গঠনে সমর্থ হবে।

মুক্তবুদ্ধির প্রাধান্য সম্বন্ধে বেগম রোকেয়ার মতামত তাঁর প্রবন্ধগুলোতে[৪] অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেবলমাত্র তাঁর সেই মতামতই নয়, বরং বুদ্ধি প্রয়োগে যুক্তির মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা প্রায়শই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমকালীন সমাজকে চাবুক মেরেছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই চাবুকটির আঘাত যেন 'স্যাটায়ার'-এর আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের প্রধান কারণ হয়ত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিষ্ঠুর ও প্রবল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষারই সুচিন্তিত প্রয়াস। কিন্তু তবুও এই 'স্যাটায়ার'-গুলো দ্বারা তিনি এই আত্মরক্ষার কাজে অনেকটা সফলকাম হয়েও এগুলোর পিছনে যে মূল উদ্দেশ্যটি, তা পাঠক সমাজকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন তা "রোকেয়া রচনাবলী"-এর "সম্পাদকের নিবেদন"[৫]-টি একটু মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি। রোকেয়ার লেখাকে কেন্দ্র করে যে-সকল বিতর্ক তখনকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে তাঁর স্যাটায়ারের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আমার এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে রোকেয়ার শাণিত যুক্তিগুলো বিশদভাবে উদ্ধৃত করা বা আলোচনা করা সম্ভব নয় এবং এই কাজটি অদূর ভবিষ্যতের কোন গবেষক সম্পন্ন করবেন সে আশা নিয়ে আমি মাত্র কয়েকটি যুক্তি নীচে উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃত যুক্তিগুলোর সবলতার স্পষ্টতা অন্য কারো বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা এবং সেগুলো স্বগুণেই প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম বলেই আমার বিশ্বাস। এই সাবলীল যুক্তির একটি হল :

> স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদের অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ-পক্ষ হইতে যতই সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের (sic) সহিত আমাদের [স্ত্রীজাতির] বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা (sic) বাড়িতেছে! ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।[৬]

দর্শনের নানা গ্রন্থে প্রখ্যাত দার্শনিকদের দেয়া বহু সাদৃশ্য-অনুমানের (Analogy) তুলনায় রোকেয়ার এই যুক্তিটি যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের সে কথা বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। 'দানবীরগণ'-এর ভিক্ষুকদের দান করা এবং পুরুষজাতির স্ত্রীজাতিকে অবলা দেখে সাহায্য করা, এই উভয় কাজের মধ্যেই যে দুর্বলকে আরো অধিক দুর্বল করে রেখে তাদের দুর্বলতার সুযোগে সবলদের যথাক্রমে পরকালের এবং ইহকালের পাথেয় সংগ্রহ করা, সে তথ্যটি বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সুচারুভাবে স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। উত্তম সাদৃশ্য-অনুমানের সকল বৈশিষ্ট্যগুলোই এই যুক্তিটিতে রয়েছে।

রোকেয়ার যুক্তিগুলোর অপর একটি আমি নীচে উদ্ধৃত করছি। ভাষাতত্ত্ববিদের মত ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো একটি অতি সুন্দর এবং উন্নত মানের যুক্তি রোকেয়া দিচ্ছেন :

"দাসী" শব্দে অনেক শ্রীমতি আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণকর্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে 'স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর' বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? যদি বলেন, স্ত্রী পতি-প্রেম-পাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারেনা। কিন্তু পুরুষও কি ঐ রূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? ···সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে "প্রেম-দাস" না বলিয়া স্বামী বলে কেন?[৭]

রোকেয়ার অপর একটি সাদৃশ্য-অনুমান অতিশয় আকর্ষণীয়:

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?[৮]

সমাজ-সংস্কারক রূপে বেগম রোকেয়াকে কেবলমাত্র নারী-অধিকারবাদী বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এইভাবে রোকেয়াকে মূল্যায়ন করা হলে তাঁর কার্য-কলাপের সামগ্রিক মূল্যায়ন না করে আংশিক মূল্যায়ন করা হবে মাত্র।

যে-কোন সমাজের অর্ধাংশ যে নারীসমাজ সেই নারী সমাজের পাশ্চাৎপদতা এবং বুদ্ধির আচ্ছন্নতা সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির পথে যে একটি প্রচণ্ড বাধা রোকেয়া সে সত্য উপলব্ধি করেন। যেহেতু তিনি নিজেই সেই পশ্চাৎপদ অর্ধাংশের একজন সদস্য, সেহেতু তিনি নিজ কর্মপ্রেরণা ও শক্তিব্যয়ে তাকে অধঃপতনের পথ থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরম উদ্দেশ্যটি ছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির অগ্রগতি। এ মতের সপক্ষে তাঁর নিজস্ব লেখা থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

··· আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।[৯]

এই একই দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রোকেয়া "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে সাদৃশ্য-অনুমানের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান। তিনি নারী ও পুরুষ এই উভয়কে নিয়ে গঠিত সমাজকে একটি 'আঙ্গিক সমগ্র' (Organic whole) হিসেবে মনে করেছেন—এই সমগ্রটির অর্ধেকটি যদি বাকী অর্ধেকের চেয়ে অনুন্নত হয়ে পড়ে তবে সমগ্ররূপে তাও অনুন্নত হয়ে পড়বে, মান হয়ে যাবে নিম্নতর। মানব জাতিকে তিনি 'দ্বিচক্র শকট'-এর মতনই একটি আঙ্গিক ঐক্যের নিদর্শন ধরে নিয়ে নীচের সাদৃশ্য-অনুমানটি দিয়েছেন:

··· তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়; সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না;—সে কেবল একই স্থানে (গৃহ কোণেই) ঘুরিতে থাকিবে।[১০]

অর্থাৎ, যে সমাজের যথার্থ অর্থে সমভাবে প্রাধান্যময় দুটি অংশ একই মানের নয়, সে সমাজে গতি আসতে পারেনা। সে সমাজ সভ্যতার প্রগতির পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন আবর্তের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে ঘুরতে থাকবে। বেগম রোকেয়ার মতে আমাদের বাঙালী সমাজ এই একই কারণে আপন 'গৃহকোণে' আশ্রিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামীকে তাড়িত করে মুক্ত হতে অক্ষম। অন্যান্য প্রগতিশীল সমাজ থেকে তাই বাঙালী বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবলই পিছিয়ে পড়ছে।

নারীকে পুরুষের "দাসী" মনে করার পিছনে অযৌক্তিকতাটিকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টায় রোকেয়া অপর একটি অতি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন :

> স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে (sic) নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ, জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন-না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। ... কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতিগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন?[১১]

স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা আদর্শগতভাবে পরস্পরের পরিপূরক। তাদের পক্ষে একে অপরের "স্বামী" বা "দাসী" মনে করে যথাক্রমে উচ্চমন্যতা বা হীনমন্যতার ভাব পোষণ করার মধ্যে যে অযৌক্তিকতা তা স্পষ্ট করে দেখাবার চেষ্টায়ই রোকেয়ার এই বলিষ্ঠ এবং যুক্তিসম্মত উক্তি।

মানব জাতির অর্ধঅঙ্গ এই নারী সমাজকে পুতুলের মতন 'অবচেতন' না হয়ে জ্ঞানের আলোকে সচেতন এবং আপন বুদ্ধিতে বলীয়ান হয়ে স্বাধীন হতে রোকেয়া আহ্বান করেছেন। সেই আহ্বানকে নারী সমাজের অন্ধকার মনের আবদ্ধ কুঠরীতে প্রবেশ করাবার সাধনায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। তাঁর ধ্যান ধারণা ও সমগ্র সত্তা জুড়েই ছিল সেই একই উদ্দেশ্য : শুধুমাত্র আচ্ছন্ন বুদ্ধি নিয়ে পুরুষের হাতের পুতুলের মত হয়ে বাঁচবার মধ্যে নারী-জীবনের যে অর্থহীনতা আর অসারতা নিহিত রয়েছে সে সত্যটি সমাজের নারী-পুরুষ উভয়কে অবহিত করানো। পুতুলের জীবনের অসারতা বোঝাতে তিনি পরম ধার্মিক রাম ও পতিপ্রাণা সীতার মধ্যেকার যে সম্পর্ক সে সম্পর্ককে একটি বালক আর পুতুলের সম্পর্কেরই মতন, এই মত প্রকাশ করেছেন। দুঃসাহসের পরিচায়ক তাঁর এই উক্তিটি। কারণ, রাম ও সীতার মধ্যেকার সম্পর্ককে আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক রূপে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ গণ্য করত। রোকেয়া এই সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন :

> পুতুলের সঙ্গে বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে ভালবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারানো পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; —কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অবচেতন পদার্থ।[১২]

এই অবচেতন পদার্থ স্বরূপ নারী সমাজকে জ্ঞানের অমৃত পানে সচেতন হয়ে উঠতে হবে এবং এই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হল কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হলে তবেই মানব জাতির মুক্তি।

এই মুক্তবুদ্ধি মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া তাঁর সর্বশেষ কিন্তু অসমাপ্ত প্রবন্ধ "নারীর অধিকার" ১৯৩২ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাতে লেখেন। ৯ই ডিসেম্বর প্রত্যুষে তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রবন্ধটি তাঁর পড়ার টেবিলে পেপার-ওয়েট দ্বারা চাপা দেয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এই তথ্যটি বেগম রোকেয়া নারী সমাজের মুক্তি এবং নারী-অধিকারবাদ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সমাধান চেষ্টায় যে গভীরভাবে নিয়োজিত ছিলেন তার একটি সুস্পষ্ট এবং জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। যে মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে বেগম রোকেয়া স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্টভাবে নারীমুক্তির তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং নারী সমাজকে অজ্ঞানতার তমসাচ্ছন্ন আবদ্ধতা থেকে মানসিক ও সামাজিক অর্থাৎ নারীর অভ্যন্তরীণ জগৎ ও বহির্জগতের বুদ্ধিমুক্তির আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে বেরিয়ে আনার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সে মুক্তবুদ্ধির সাথে নারীমুক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে রোকেয়া নিজে কি বলেছেন তা আমাদের জানা আবশ্যক। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা ওরফে জয়নব-এর উক্তি থেকে রোকেয়ার নারী-অধিকারবাদীর মতবাদের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সিদ্দিকার প্রতিটি বক্তব্য মুক্তবুদ্ধির পরিচায়ক এবং স্ব-অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এই তেজস্বী নায়িকার বক্তব্য ও উক্তি উপরে উল্লিখিত রোকেয়ার নিজস্ব যুক্তিগুলোর মতই বৈধ এবং যুক্তিসঙ্গত। বলাই বাহুল্য, এইগুলোও প্রকারান্তরে রোকেয়ার নিজস্ব যুক্তি, শুধুমাত্র উপন্যাসের নায়িকার উক্তি জনসাধারণের মনে সহজেই স্থান করে নিতে সক্ষম হবে সেই আশায় সিদ্দিকার উক্তিরূপে সেগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র।

সিদ্দিকা ওরফে জয়নবের বক্তব্যের কয়েকটি নীচে উল্লেখ করছি :

> আমি যদি উপেক্ষার লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকু'মাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আরে রাখ তোমার পণ ও তেজ—ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।" আর পুরুষ-সমাজ সগর্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহিয়সী, গরীয়সী হউক না কেন,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে!" আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।[১৩]

সিদ্দিকার এই আত্মপ্রত্যয়ের পিছনে যে শক্তির উৎস রয়েছে সেটা কি? এই আত্মপ্রত্যয়ের উৎস হল : সিদ্দিকা জ্ঞানার্জন করেছে, সে আর অবরোধ-বাসিনী নয়; তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে কারণ 'তিনি কর্মালয়ে প্রতি মাসে ২০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন'।[১৪] বুদ্ধিমুক্তির সাথে সাথে সিদ্দিকার আবার এসেছে অর্থনৈতিক মুক্তি—জীবন ধারণের জন্য তাকে আর পুরুষের মুখাপেক্ষী হতে হয়না। তাই সে তার স্বামীর প্রস্তাবকে প্রত্যয়ের সাথে প্রত্যাখান করতে সক্ষম এবং সেই সঙ্গে তার স্বামীকে দৃঢ়ভাবে বলতে পারে :

> তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি।[১৫]

অর্থাৎ স্বামীর পথ ছাড়াও তার নিজস্ব ভিন্ন একটি পথ রয়েছে যে পথ চলার ক্ষেত্রে দিশারী হবে সিদ্দিকার নিজস্ব বুদ্ধি ও বিবেক। এই উক্তিটির পিছনে যে প্রচ্ছন্ন অর্থ

রয়েছে তা আমরা অন্যত্র অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত দেখতে পাই। সিদ্দিকার স্বামী লতীফ সিদ্দিকার সাথে 'আকদ্' হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার পিতৃব্যের আদেশক্রমে আবার বিয়ে করেছিল। আর আজ সিদ্দিকাকে 'পদ্মরাগ'-এর মতন দেখে অভিভূত হয়ে আবার গ্রহণ করতে চায়। স্বাধীন সিদ্দিকাকে লতীফ তার এই প্রস্তাবে সম্মত হতে বার বার অনুরোধ জানায়। সিদ্দিকার এই অনুরোধ প্রত্যাখানের পিছনে যুক্তিটি এই :

> আমি বলি, তুমি হাতের চুড়িটা ভাঙ্গিবার জন্য দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ, পদদলিত করিয়াছ,—কিন্তু যদি পরমায়ু-বলে চুড়িটা না ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে তাহাকে কুড়াইয়া লইতে চেষ্টা কেন?[১৬]

এই যে পরমায়ু-বলে 'না ভাঙ্গিয়া' বেঁচে থাকার কৃতিত্ব তা চুড়ির নিজস্ব। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সিদ্দিকার সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে শুধু বেঁচে থাকাই নয়, বরং একেবারে 'পদ্মরাগের' মত হয়েই অস্তিত্বশীল হওয়া, তা কিন্তু তাঁর স্বামী লতীফকে তাঁর জীবনে ফিরে পাবার উদ্দেশ্যেই নয়—স্বীয় সত্তার পরিপূর্ণতার জন্য এবং সমগ্র নারী সমাজের সম্মুখে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনই তার উদ্দেশ্য। 'সংসার ধর্মই নারীর সার ধর্ম নহে'—পুত্তলিকার জীবনই নারীর জীবনের পরমার্থ নয়। নারীকে বুদ্ধিমুক্তির পথে অগ্রসর হয়ে আপন ব্যক্তিত্বে মহীয়ান হয়ে উঠতে হবে; বুদ্ধি আর প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখতে সক্ষম হতে হবে। এই আদর্শ নারী-জীবন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর প্রয়োজন বেগম রোকেয়ার মতন পথপ্রদর্শক একাধিক মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বশীল নারী।

## তথ্য-নির্দেশ

১. রোকেয়া রচনাবলী, কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৯
২. ১৯০৮ সালে *Sultana's Dream* পুস্তিকা-আকারে বের হয়।
৩. পদ্মরাগ, এ উপন্যাস কবে প্রকাশিত হয়েছিল আমার পক্ষে সে সম্বন্ধে তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।
৪. মতিচূর, ১ম এবং ২য় খণ্ডে সংকলিত প্রবন্ধগুলো দ্রষ্টব্য। ১ম খণ্ড : প্রকাশিত ১৯০৫ সালে এবং ২য় খণ্ড ১৯২১ সালে।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৭-২৩
৬. "স্ত্রী জাতির অবনতি", মতিচূর, ১ম খণ্ড, রোকেয়া রচনাবলী, পৃষ্ঠা ১৭
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯
৮. "অর্ধাঙ্গী", ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩১
১০. "অর্ধাঙ্গী", ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩
১২. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭
১৩. পদ্মরাগ, রোকেয়া রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৪৫২-৫৩
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৪১৩
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫৯
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫৬